টোকাম্যাক

কৃত্রিম সূর্য

জয়ন্ত বসু

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

টোকাম্যাক ঃ কৃত্রিম সূর্য

জয়ন্ত বসু

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700006

মুখবন্ধ

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য পরিষদ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বই প্রকাশ করে আসছে এবং সম্প্রতিকালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণার সাফল্য মানুষকে জানাবার জন্যও বিভিন্ন বই প্রকাশে অগ্রণী হয়েছে। টোকাম্যাক বা কৃত্রিম সূর্য এরকমই একটি বই।

আগুন আবিষ্কারের পর থেকেই সভ্যতার চক্র অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই গতির মূলে রয়েছে মানুষের অনলস প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের নিত্যনতুন অবদান। গতির দ্রুতময়তার জন্য প্রয়োজন হল শক্তির। হাজার হাজার বছর ধরে এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পৃথিবীতে মজুদ জ্বালানী ভাণ্ডার অর্থাৎ কয়লা, খনিজ তেল আর গ্যাস আজ প্রায় নিঃশেষিত। পারমাণবিক চুল্লিতে উৎপন্ন শক্তি ভবিষ্যতের চাহিদার তুলনায় সামান্য এবং এর থেকে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় ভস্মও মানুষের কাছে এক মারাত্মক বিপদ। তাই মানুষ আজ সংযোজন পদ্ধতিতে সূর্যে উৎপন্ন অফুরন্ত শক্তির মত টোকাম্যাক যন্ত্রে কৃত্রিম সূর্য তৈরী করতে বদ্ধপরিকর। সাফল্যও এসেছে কল্পনাতীত। এই বইটিতে তারই অবতারণা করেছেন সাহা ইনস্টিটিউটের নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধ্যাপক (ডঃ) জয়ন্ত বসু। শক্তি সঙ্কটের মোকাবিলায় আধুনিক বিজ্ঞানের অসামান্য সাফল্য পাঠকের কাছে তুলে ধরার জন্য পরিষদকে বইটি দান করায় ডঃ বসুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি বইটি সর্বস্তরের মানুষের কাছে আদৃত হবে।

শ্রীমিহির ভট্টাচার্য ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ প্রকাশনায় যে সযত্ন সহযোগিতা করেছেন—তার জন্য তাঁরা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

ডঃ সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কোলকাতা
ফেব্রুয়ারী, 4, 1988

শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ

আমাদের জীবনধারণের জন্যে যেমন অক্সিজেনের প্রয়োজন, মানব সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তেমনি প্রয়োজন হল শক্তির। আধুনিক যুগে এই শক্তি প্রধানত বিদ্যুৎ-শক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়, তবে যান্ত্রিক শক্তি, তাপীয় শক্তি ইত্যাদিরও বেশ কিছুটা ব্যবহার আছে। শিল্প, কৃষি, যানবাহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতিতে, এমনকি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক উপকরণেও শক্তির অজস্র ব্যবহার। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সভ্যতার অগ্রগতি, এই দুইয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে শক্তির চাহিদা দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। অথচ যে সব উৎস থেকে আমরা শক্তি পাই, তাদের কতকগুলির মজুদ ভাণ্ডার ক্রমশ কমে আসছে, অন্যগুলির ক্ষেত্রে শক্তি সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেজন্যে কয়েক দশক পরে শক্তির দুর্ভিক্ষের প্রবল সম্ভাবনা। বহু বিজ্ঞানীর মতে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে যদি মানুষ এক ধরনের কৃত্রিম সূর্য তৈরি করতে পারে, আকারে যা, বলা বাহুল্য, সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু প্রকৃতিতে প্রায় একই রকম। এটা সম্ভব হলে কয়েক শো কোটি বছরের জন্যে আর শক্তির অনটন নিয়ে ভাবতে হবে না, বলতে গেলে চিরকালের জন্যেই শক্তি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

কাজটি কিন্তু সহজ নয়। গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনো সার্থক কৃত্রিম সূর্য তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এই কাজকে বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলা যায়।

এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা নানা রকম যন্ত্র তৈরি করে সেগুলিকে কৃত্রিম সূর্য হিসাবে কাজ করানো যায় কিনা, তাই নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং এখনো করছেন। যে যন্ত্র সবচেয়ে আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে, তার নাম টোকামাাক। এই যন্ত্র ব্যবহার করে গত বিশ বছরে বিজ্ঞানীরা সাফল্যের পথে অনেকখানি এগিয়েছেন। প্রায় সব দেশেই এবং আন্তর্জাতিক ভাবেও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, যদি কৃত্রিম সূর্য তৈরি করা সম্ভব হয়, তবে তা সর্বপ্রথম সম্ভব হবে টোকামাাক যন্ত্র ব্যবহার করে। এজন্যে

কৃত্রিম সূর্য নির্মাণের যে চ্যালেঞ্জ, তা আজ পর্যবসিত হয়েছে সফল টোকাম্যাক তৈরি করবার চ্যালেঞ্জে।

এরকম টোকাম্যাক নির্মাণের এখনো যেমন অনেকগুলি প্রযুক্তিগত সমস্যা আছে, তেমনি আবার রয়েছে টোকাম্যাকের অভ্যন্তরীণ কর্ম-কাণ্ড সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মৌলিক সমস্যাও। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্যে নানান আকারের ও নানান বৈশিষ্ট্যের টোকাম্যাক নিয়ে বহু দেশেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আমাদের দেশে কলকাতার সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর গবেষণাগারে সম্প্রতি একটি টোকাম্যাক যন্ত্র বসানো হয়েছে। উদ্দেশ্য ঃ কয়েকটি মৌলিক সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণা এবং এ ধরনের যন্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন ও পারদর্শিতা লাভ। ভারতে এইটিই সর্বপ্রথম টোকাম্যাক। গুজরাটের গান্ধীনগরে ইন্সটিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠানে আর একটি টোকাম্যাক নির্মাণের তোড়জোড় চলেছে।

● শক্তি-সমস্যার স্বরূপ ও তার সম্ভাব্য সমাধান

সভ্যতার চাকাকে সচল রাখবার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন, ভবিষ্যতে তার যোগান অব্যাহত রাখবার সমস্যাটি কী, তা একটু আলোচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে শক্তির মূল উৎস হল কয়লা, খনিজ তেল ও গ্যাস। সমস্ত পৃথিবীতে যত শক্তির ব্যবহার হয়, তার শতকরা প্রায় পঁচাশি ভাগ পাওয়া যায় এগুলি থেকে। এগুলিকে বলা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি (fossil fuel) কারণ বহু কোটি বছর আগে মাটির নিচে চাপা পড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের রূপান্তরে এগুলির উৎপত্তি। ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে এই সব জ্বালানির মজুদ ভাণ্ডার যেমন দ্রুত হারে কমে আসছে, তাতে হিসেব করে বলা যায় যে, কয়েক দশক পরেই ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির মজুদ নিঃশেষিত হবে—তেল ও গ্যাস নিঃশেষিত হবে সম্ভবত এখন থেকে 10-12 বছরের মধ্যেই। তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে, জীবাশ্ম জ্বালানির মজুদ সব দেশে সমান নয়—যে সব দেশে নেই বা থাকলেও কম, তাদের ক্ষেত্রে সঙ্কট অনেক আগেই ঘনীভূত হবে।

জলস্রোত, জোয়ার-ভাঁটা, বায়ু চলাচল ইত্যাদি থেকে যে শক্তি পাওয়া যেতে পারে, তার পরিমাণ চাহিদার তুলনায় খুবই কম। ভূপৃষ্ঠে মোট সৌরশক্তির পরিমাণ বিপুল হলেও তা এত বিস্তীর্ণ স্থানের উপর ছড়িয়ে থাকে যে, তা দিয়ে আঞ্চলিক কিছু কিছু

কাজকর্ম সম্ভব হলেও ব্যাপক চাহিদার যোগান দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তাহলে ভরসা কেবল পারমাণবিক শক্তি। বর্তমানে যে ধরনের পারমাণবিক চুল্লি থেকে আমরা শক্তি পাই, তাকে বলা হয় বিভাজন চুল্লি (fission reactor)। কারণ ইউরেনিয়াম-235 আইসোটোপের মতন অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বিভাজনের (অর্থাৎ প্রায় সমান দুটি খণ্ডে ভেঙে যাওয়ার) ফলে উৎপন্ন যে শক্তি, তাই রয়েছে এই চুল্লির কার্যকারিতার মূলে। মাত্র এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তা 4,000 টন কয়লার শক্তির সমান। তবুও বিভাজন চুল্লির উপযোগী জ্বালানি মেলে যে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম থেকে, পৃথিবীর বুকে তাদের সঞ্চয় সীমিত হওয়ায় বিভাজন চুল্লির ব্যাপক ব্যবহার শক্তির অনটনকে খুব বেশি হলে কয়েক দশক হয়তো পিছিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া এই ব্যাপক ব্যবহারের একটি বড় সমস্যাও আছে। বিভাজন চুল্লিতে যে তেজস্ক্রিয় ভস্ম উৎপন্ন হয়, তার সদ্‌গতি করা এক দুরূহ সমস্যা। 2000 খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীতে যে মোট শক্তি ব্যয়িত হবে, তা যদি কেবল বিভাজন চুল্লি থেকে সংগ্রহ করা হয়, তাহলে যে তেজস্ক্রিয় ভস্মের সৃষ্টি হবে, তা প্রায় এক কোটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় ভস্মের সমান!

আর একরকম পারমাণবিক চুল্লিও হতে পারে, যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় 'সংযোজন চুল্লি' (fusion reactor), সাধারণ-ভাবে আমরা বলতে পারি 'কৃত্রিম সূর্য'। এতে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের মতন হাল্কা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সংযোজনের (অর্থাৎ জুড়ে যাওয়ার) ফলে বিপুল শক্তির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। আসলে এই বিক্রিয়ায় সামান্য কিছুটা ভর রূপান্তরিত হয় বিপুল শক্তিতে। (ভরের শক্তিতে রূপান্তরের বিষয়টি তত্ত্বগত ভাবে সর্বপ্রথম জানা গেছলো বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে)। আমাদের সুপরিচিত নক্ষত্র সূর্য এবং আরো বহু নক্ষত্রে নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হচ্ছে। সূর্যের মধ্যকার অত্যধিক উষ্ণতায় (কেন্দ্রস্থলে উষ্ণতা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস) সেখানকার হাইড্রোজেন গ্যাসের অণু-পরমাণুরা অত্যন্ত গতিশীল হয় এবং তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষের

ফলে পরমাণু-পরিবার ভেঙে গিয়ে ভিতরের ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস (এক্ষেত্রে প্রোটন কণা) মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে। এইরকম বহু মুক্ত ইলেকট্রন ও সমানসংখ্যক নিউক্লিয়াসের সমাবেশকে 'প্লাজমা' বলা হয়। প্লাজমা হল পদার্থের একটি বিশেষ অবস্থা—চতুর্থ অবস্থা, পদার্থের তৃতীয় অবস্থা গ্যাসের সঙ্গে যার অনেক পার্থক্য আছে। যা হোক, সূর্যের অত্যন্ত উষ্ণ প্লাজমা মাধ্যমে নিউক্লিয়াসগুলি প্রচন্ড গতিসম্পন্ন হয় এবং সেই গতির ফলে পারস্পরিক বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ সত্ত্বেও পরস্পরের খুব কাছে চলে আসতে পারে। তখন নিউক্লিয় সংযোজন ঘটে থাকে। বিজ্ঞানীরা যে সংযোজন চুল্লি নির্মাণে সচেষ্ট আছেন, তাতে সূর্যের উষ্ণ প্লাজমার মতন (বস্তুত আরো উষ্ণ) প্লাজমা তৈরি করা হবে এবং সেই প্লাজমায় যথেষ্ট সংখ্যক নিউক্লিয় সংযোজন ঘটলে বিপুল শক্তির উদ্ভব হবে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মানুষ পঞ্চাশের দশকেই নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচন্ড শক্তি সৃষ্টি করতে পেরেছে, তবে তা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে, হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে। সংযোজন চুল্লিতে সেই হাইড্রোজেন বোমাকে যেন পোষ মানানো হবে, তার শক্তির উৎপত্তি হবে নিয়ন্ত্রিত ভাবে, যাতে মানুষ ইচ্ছা মতন সেই শক্তিকে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করতে পারে।

সূর্যের জ্বালানি যে সাধারণ হাইড্রোজেন, ক্ষুদে সূর্যরূপ সংযোজন চুল্লিতে তা ব্যবহার করলে নিউক্লিয় সংযোজন যথেষ্ট সংখ্যায় হবে না। সংযোজন চুল্লির মূল জ্বালানি ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম। জল থেকে এই ডয়টেরিয়াম পাওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের জলের অণুতে যে হাইড্রোজেন আছে, তার 6500 ভাগের এক ভাগ হল ডয়টেরিয়াম। ঐ জলরাশির পরিমাণ সুবিশাল হওয়ায় মজুদ ডয়টেরিয়ামের পরিমাণও যথেষ্ট। হিসেব করে দেখা যায় যে, এক লিটার জলে যেটুকু ডয়টেরিয়াম আছে, তাই থেকে যে শক্তি পাওয়া যেতে পারে, তা 350 লিটার পেট্রোলের শক্তির সমান। সমুদ্রের জলে যে ডয়টেরিয়াম আছে, সংযোজন চুল্লির জ্বালানি হিসেবে তা মনুষ্য-সভ্যতার চাহিদাকে কয়েক শো কোটি বছর মেটাতে পারবে। সুতরাং বলা যায়, সংযোজন চুল্লি নির্মাণের প্রচেষ্টা সফল হলে কার্যত চিরকালের জন্যে শক্তি-সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, সংযোজন চুল্লি নির্মাণের কাজ কিছুটা সহজ হয় যদি কেবল ডয়টেরিয়াম ব্যবহার না করে ডয়টেরিয়াম ও

হাইড্রোজেনের অন্য আইসোটোপ ট্রিটিয়ামের মিশ্রণকে সংযোজন চুল্লির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাতেও বেশ অনেক কাল শক্তির যোগান দেওয়া সম্ভব. কারণ ট্রিটিয়ামকে তৈরি করে নেওয়া যায় লিথিয়াম থেকে, যা ভূত্বকে মোটামুটি যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

সাফল্যের শর্ত

গত তিরিশ বছর ধরে চেষ্টা করেও বিজ্ঞানীরা যে এখনো সংযোজন চুল্লি নির্মাণে সাফল্য লাভ করতে পারেননি, তার কারণ হল এই সাফল্যের জন্যে দুটি দুরূহ শর্তকে অবশ্যই পালন করতে হবে। এ বিষয়ে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

প্লাজমা মাধ্যমে নিউক্লিয় সংযোজন ঘটাতে হলে যে সেই প্লাজমার উষ্ণতা কেন খুব বেশি হওয়া দরকার, তা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু কেবল নিউক্লিয় সংযোজন ঘটলেই তো হবে না, প্রতি সেকেণ্ডে সংযোজনের সংখ্যা যথেষ্ট হতে হবে যাতে সংযোজনের ফলে উৎপন্ন মোট শক্তি উষ্ণ প্লাজমা থেকে বিকিরণের ফলে বিনষ্ট শক্তির চেয়ে বেশি হয় এবং প্লাজমা থেকে উদ্বৃত্ত শক্তি পাওয়া যেতে পারে কাজে লাগানোর জন্যে। অর্থাৎ এ যেন বলা যায়, প্লাজমার আয় তার নিজের ব্যয়ের থেকে বেশি হতে হবে যাতে তার উদ্বৃত্ত সম্পদ সে অন্যকে দিতে পারে। এর জন্যে প্লাজমার উষ্ণতা কত হতে হবে, তা হিসেব করে দেখা হয়েছে। সংযোজন চুল্লির জ্বালানি ডয়টেরিয়াম হলে সেই চুল্লির সাফল্যের প্রথম শর্ত ঃ প্লাজমার উষ্ণতা অন্তত 40 কোটি ডিগ্রি সেলিসিয়াস হওয়া দরকার। জ্বালানি হিসেবে ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের মিশ্রণ ব্যবহার করলে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা অন্তত চার কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাস্তব ক্ষেত্রে প্লাজমা থেকে বিকিরণ ছাড়াও অন্যান্য ভাবে শক্তিক্ষয় হয় বলে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা আরো কিছুটা বেশি হওয়া দরকার—যেমন কার্যকর সংযোজন চুল্লিতে ডয়টেরিয়াম-ট্রিটিয়াম জ্বালানির ক্ষেত্রে উষ্ণতা হতে হবে দশ থেকে কুড়ি কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই সব উষ্ণতার কাছে সূর্যের কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতাও হার মেনে যায়।

সূর্যের চেয়েও মানুষের তৈরী সূর্যের উষ্ণতা যে বেশি হওয়া দরকার, তার কারণ হল—সূর্যের তুলনায় এর আয়তন অনেক কম হওয়ায় সংযোজনের ফলে উৎপন্ন শক্তি বহুলাংশে কম হয় ; বিকিরণের

ফলে বিনষ্ট শক্তির পরিমাণও তেমনি কমে যায় বটে কিন্তু ঠিক ঐ অনুপাতে কমে না। সেজন্যে বিনষ্ট শক্তির সঙ্গে উৎপন্ন শক্তির অনুপাতকে সমান রাখতে হলে উষ্ণতাকে অপেক্ষাকৃত বেশি করা দরকার।

সূর্যের চেয়েও উষ্ণ প্লাজমা তৈরি করা যেমন এক মহা-সমস্যা, তেমনি আর এক বিরাট সমস্যা হল তাকে নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা। কারণ ঐ প্লাজমার মধ্যে প্রচণ্ড গতিশীল কণাগুলির পক্ষে চারদিকে ছড়িয়ে পড়াই স্বাভাবিক। অথচ যে আধারের মধ্যে প্লাজমার সৃষ্টি হবে, প্লাজমা যদি তার দেওয়ালের সংস্পর্শে আসে, তাহলে তাপ পরিবহণের ফলে প্লাজমার উষ্ণতা অচিরেই অনেকখানি কমে যাবে। কিন্তু উষ্ণ প্লাজমা অন্তত খানিকক্ষণ স্থায়ী হলে তবেই তার মধ্যে বেশ কিছু নিউক্লিয়াসের সংযোজন ঘটতে পারে। আবার ঐ সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক নিউক্লিয়াসের সংযোজন ঘটতে হলে নিউক্লিয়াসের সংখ্যাও যথেষ্ট হওয়া দরকার। বস্তুত বিজ্ঞানী জে ডি লসন হিসেব করে দেখান যে, সংযোজন চুল্লিতে উষ্ণ প্লাজমা তৈরি করতে যে শক্তি ব্যয়িত হবে ও বিকিরণের ফলে যে শক্তিক্ষয় ঘটবে, উৎপন্ন কার্যকর শক্তিকে যদি তাদের যোগফলের চেয়ে বেশি হতে হয়, তবে n ও t-এর গুণফলকে একটি নির্দিষ্ট মানের চেয়ে বেশি হতে হবে, যেখানে n হল প্লাজমার প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা এবং t হল সেকেণ্ডের হিসেবে প্লাজমার স্থায়িত্বকালের পরিমাণ। এইটিই হচ্ছে সংযোজন চুল্লির সাফল্যের দ্বিতীয় শর্ত। লসনের নামানুসারে একে বলা হয় ‘লসনের শর্ত’। সংযোজন চুল্লির জ্বালানি যদি কেবল ডয়টেরিয়াম হয়, তাহলে উক্ত নির্দিষ্ট মান হল 10^{16} ; জ্বালানি ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের সংমিশ্রণ হলে ঐ মান হচ্ছে 10^{14}।

বর্তমানে সংযোজন চুল্লি নির্মাণের প্রচেষ্টা চলেছে মূলত দুটি পদ্ধতিকে অবলম্বন করে। প্রথম পদ্ধতিতে বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে বা অন্য কোন ভাবে উষ্ণ প্লাজমা তৈরি করে চুম্বকক্ষেত্র দিয়ে গঠিত এক অদৃশ্য পিঞ্জরে তাকে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করা হয়। চুম্বকক্ষেত্রের একটি ধর্ম এই যে, তা গতিশীল আহিত (অর্থাৎ বিদ্যুৎসম্পন্ন) কণার গতিকে প্রভাবিত করতে পারে। সংযোজন চুল্লির মধ্যে এমন চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করা হয়, যাতে বাইরের দিকে আগত

কণাগুলির দিক পরিবর্তিত হয় এবং কণাগুলি চলে যায় ভিতরের দিকে। এইভাবে চুম্বকক্ষেত্র যেন এক পিঞ্জরের সৃষ্টি করে, প্লাজমা যার বাইরে আসতে পারে না। চৌম্বক আবদ্ধকরণের ভিত্তিতে যে সব বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলির নাম হল টোকাম্যাক, স্টেলারেটর, চৌম্বক দর্পণ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে প্লাজমায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা মোটামুটিভাবে 10^{14}; সুতরাং লসনের শর্ত পালিত হওয়ার জন্যে ডয়টেরিয়াম-ট্রিটিয়াম জ্বালানির ক্ষেত্রে প্লাজমার স্থায়িত্বকাল অন্তত 1 সেকেণ্ড হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে লেসার নামক বিশেষ রকম আলোর উৎস থেকে সুতীব্র রশ্মি নিক্ষেপ করা হয় ক্ষুদ্রাকৃতি ডয়টেরিয়াম-ট্রিটিয়াম খণ্ডের উপর। ঐ খণ্ডটি নিমেষের মধ্যে উষ্ণ প্লাজমায় রূপান্তরিত হয় এবং প্রথমে সংকোচনের ফলে তার ঘনত্ব যায় খুব বেড়ে। তবে সামান্য সময় পরেই প্লাজমা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেসার রশ্মির পরিবর্তে দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুচ্ছ বা আয়ন-গুচ্ছকেও প্লাজমা তৈরি করবার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ঘন প্লাজমার স্থায়িত্বকাল মোটামুটিভাবে মাত্র 1 ন্যানো সেকেণ্ড (অর্থাৎ 1 সেকেণ্ডের 100 কোটি ভাগের 1 ভাগ)। কিন্তু প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে কণার সংখ্যা 10^{26} হতে পারে বলে লসনের শর্ত পালিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

● টোকাম্যাক—সবচেয়ে উজ্জ্বল সম্ভাবনা

সংযোজন চুল্লি নির্মাণের জন্যে যত রকম যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল টোকাম্যাক (Tokamak), কারণ এ পর্যন্ত যে সমস্ত ফল পাওয়া গেছে, তা থেকে অধিকাংশ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের কর্মকর্তাদের ধারণা হয়েছে যে, এই যন্ত্র ব্যবহার করে সার্থক সংযোজন চুল্লি নির্মাণের সম্ভাবনা সবচেয়ে উজ্জ্বল। 'টোকাম্যাক' হচ্ছে রুশ ভাষায় একটি সংক্ষেপিত শব্দ, যার সম্পূর্ণ অর্থ 'বলয়াকৃতি চৌম্বক প্রকোষ্ঠ' (toroidal magnetic chamber)। রাশিয়ার বিজ্ঞানী এল এ আর্টসিমোভিচকে টোকাম্যাকের জনক বলা হয়—ষাটের দশকের শেষের দিকে তিনিই সর্বপ্রথম টি-3 নামক টোকাম্যাক যন্ত্র ব্যবহার করে আশাব্যঞ্জক ফল লাভ করেন এবং বিজ্ঞানীদের সচেতন করেন এর সম্ভাবনা সম্পর্কে।

টোকাম্যাক যন্ত্রে একটি বলয়াকৃতি ধাতব আধারকে অনেকাংশে বায়ুশূন্য করে তার মধ্যে উষ্ণ প্লাজমা সৃষ্টি করা হয় (1 নং চিত্র
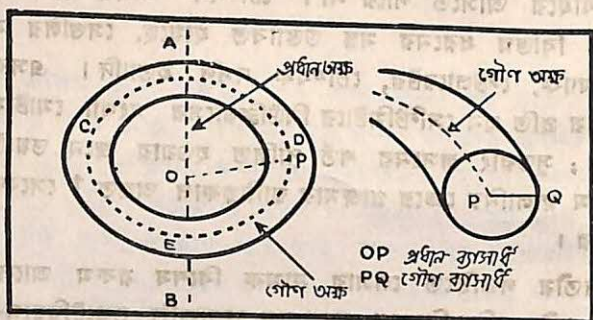
1নং চিত্র—টোকাম্যাকের বলয়াকৃতি আধার ও তার একটি উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদ

দ্রষ্টব্য)। চোঙাকৃতি বা ঐ রকম কোন আধারে প্লাজমা থাকলে সেই আধারের দুই প্রান্ত দিয়ে প্লাজমা বেরিয়ে যেতে পারে। বলয়াকৃতি আধারের কোন প্রান্ত না থাকায় এই অসুবিধা নেই। বলয়াকৃতি আধারটি যে জায়গাকে ঘিরে থাকে, তার ঠিক কেন্দ্রস্থল বরাবর যদি একটি সরলরেখা কল্পনা করা যায় (1 নং চিত্রে AOB রেখা), তা হলে সেই রেখাকে বলা হয় টোকাম্যাকের প্রধান অক্ষ (major axis)। আর আধারের ভিতরে ঠিক মাঝখান দিয়ে যদি একটি বৃত্তাকার রেখা কল্পনা করা যায়—যেমন চিত্রে CDE রেখা, তবে সেই রেখাকে বলে গৌণ অক্ষ (minor axis)। গৌণ অক্ষের যে ব্যাসার্ধ অর্থাৎ প্রধান অক্ষ থেকে তার যে দূরত্ব OP, তাকে বলা হয় প্রধান ব্যাসার্ধ (major radius)। গৌণ অক্ষের সঙ্গে আড়াআড়ি-ভাবে আধারটির যে-কোন উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদ নিলে তা বৃত্তাকার হয়; সেই বৃত্তের ব্যাসার্ধ PQ-কে বলে গৌণ ব্যাসার্ধ (minor radius)। বলয়াকৃতি আধারের মধ্যে প্লাজমাকে আবদ্ধ রাখবার জন্যে নানান উপায়ে যে উপযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়, তাই হল টোকাম্যাকের বৈশিষ্ট্য। এজন্যে এই চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, বলয়াকৃতি আধারকে বেড় দিয়ে অনেকগুলি তারকুণ্ডলী রাখা হয়, যেগুলির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালে বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় (2 নং চিত্র)। এই সব কুণ্ডলীকে বলা হয়

বলয়াকৃতি ক্ষেত্রকুণ্ডলী (toroidal field coil)। আমরা জানি, কোন গতিশীল আহিত কণার উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবের ফলে ঐ কণা চৌম্বক বলরেখার চারপাশে পাক খেতে খেতে চৌম্বক
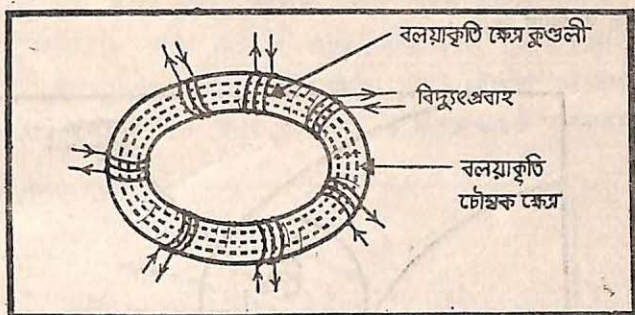
2নং চিত্র—টোকাম্যাকে বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎপত্তি

বলরেখা বরাবর চলতে থাকে (3 নং চিত্র)। সুতরাং চৌম্বক বলরেখার আড়াআড়ি পথে কণাটি যেতে পারে না। এইভাবে প্লাজমার সব কণাই চৌম্বক বলরেখাগুলি বরাবর আবদ্ধ থাকে এবং বলরেখার
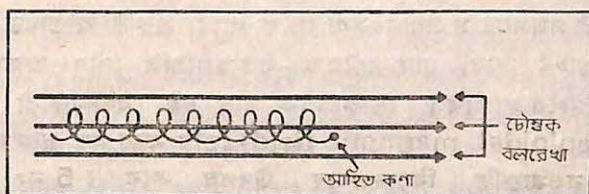
3নং চিত্র—চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে আহিত কণার গতিপথ

আড়াআড়ি পথে গিয়ে আধারের দেওয়ালে আঘাত করতে পারে না। টোকাম্যাক যন্ত্রের বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য একটি ব্যাপারও ঘটে। এই ক্ষেত্রের মান আধারের ভিতরের দিকে কম। ক্ষেত্রের মানের তারতম্যের জন্যে এবং বলরেখার বক্রতার জন্যেও আহিত কণাগুলি উপরের বা নিচের দিকে একটি অতিরিক্ত গতি লাভ করে—ঋণাত্মক ইলেকট্রন যদি উপরের দিকে যায়, ধনাত্মক নিউক্লিয়াস যায় নিচের দিকে ; আর ইলেকট্রন নিচের দিকে গেলে নিউক্লিয়াস উপরের দিকে যায় (4 নং চিত্র)। ফলে

আধারের মধ্যে উপরে ও নিচে বিপরীত আধানযুক্ত কণার আধিক্য হওয়ায় একটি উপর-নিচ বিদ্যুৎক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎক্ষেত্র ও বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্রের সম্মিলিত প্রভাবে প্লাজমা আধারের বাইরের দিকে গতিশীল হয় ও আধারের দেওয়ালে গিয়ে আঘাত করে।
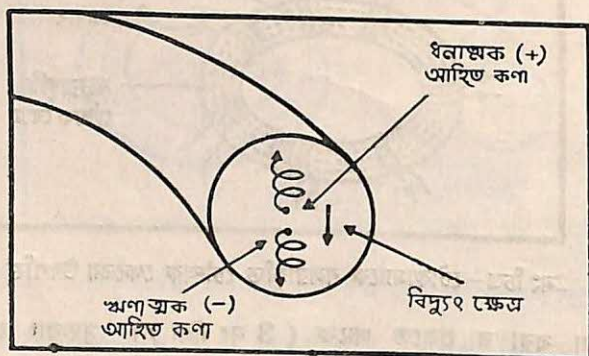
4নং চিত্র—বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্রের তারতম্য ও বলরেখার বক্রতার জন্য আহিত কণার অতিরিক্ত গতি

এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে একটি অতিরিক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যার চৌম্বক বলরেখাগুলি গৌণ অক্ষকে সর্বত্র বেষ্টন করে থাকবে। টোকাম্যাক যন্ত্রে এই বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র (poloidal magnetic field) তৈরি করা হয় প্লাজমার মধ্য দিয়ে বলয়াকৃতি বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে (5 নং চিত্র)।
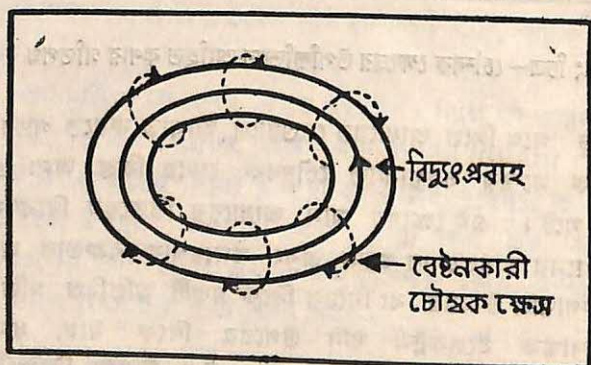
5নং চিত্র—বলয়াকৃতি আধারে বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি

বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্র ও বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র, এই দুইয়ের সমন্বয়ে যে চৌম্বক বলরেখার উৎপত্তি হয়, তা সর্পিল আকারের—বলয়ের দিক বরাবর চলতে চলতে তা কিছুটা উপর বা নিচ এবং পাশের দিকে সরে যেতে থাকে। বলয়াকৃতি আধারের গৌণ অক্ষের সঙ্গে আড়াআড়ি যে প্রস্থচ্ছেদ FGH 6 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে. ধরা যাক একটি চৌম্বক বলরেখা তাকে প্রথমে I বিন্দুতে ছেদ করে গেছে। ঐ বলরেখাকে অনুসরণ
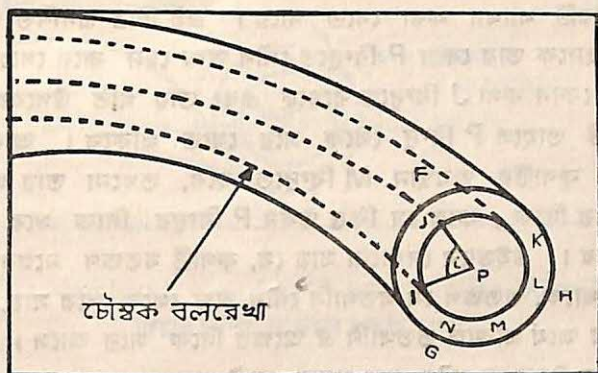
6নং চিত্র—টোকাম্যাকে চৌম্বক বলরেখার আবর্তনজাত পরিবর্তন

করলে দেখা যাবে যে, বলয়ের দিক বরাবর একবার সম্পূর্ন ঘুরে আসবার পর ঐ রেখা প্রস্থচ্ছেদ FGH-কে IJK বৃত্তের পরিধির উপরিস্থিত অন্য কোন J বিন্দুতে ছেদ করে যাচ্ছে। বলরেখাটিকে আরো অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, বলয়ের দিক বরাবর আর একবার ঘুরে এসে তা প্রস্থছেদ FGH-কে K বিন্দুতে ছেদ করছে। এইভাবে ছেদবিন্দু IJK বৃত্তের পরিধির উপর দিয়ে ক্রমাগত সরে যেতে থাকে। টোকাম্যাকে IPJ কোণের গুরুত্ব অনেকখানি ; একে বলা হয় আবর্তনজাত পরিবর্তন (rotational transform)। ক্রুসকাল ও সোফ্রানভ নামে দুজন বিজ্ঞানী তত্ত্বগত ভাবে প্রমাণ করেন যে, প্লাজমার স্থায়িত্বের জন্যে এই কোণের মান 360 ডিগ্রির চেয়ে অবশ্যই কম হতে হবে। সাধারণত অন্য ভাবে এ শর্তটিকে প্রকাশ করা হয়। ঐ কোণকে i এবং $q = 360°/i$ লিখলে সহজেই বোঝা যায় যে, প্লাজমার স্থায়িত্বের জন্যে q-এর মান 1-এর চেয়ে বেশি হতে হবে। q-কে বলা হয় 'নিরাপত্তা নির্দেশক' (safety factor) কারণ প্লাজমার অস্তিত্বের নিরাপত্তা নির্ভর করে এর মানের উপর।

যা হোক, কোন আহিত কণা যখন সর্পিল বলরেখা বরাবর চলতে থাকে, তখন তা কিছুক্ষণ বলয়াকৃতি আধারের উপরের অর্ধে থাকে (যেমন 6 নং চিত্রে I, J, K বিন্দুতে), কিছুক্ষণ থাকে নিচের অর্ধে (যেমন L, M, N বিন্দুতে)। উপর বা নিচের দিকে আহিত কণার যে ক্ষতিকারক গতির কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে (4 নং চিত্র দেখুন), এখনো সেরকম গতি থাকে কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে, এখন আর কণাটি মোটমাট উপর বা নিচের দিকে যায় না, গৌণ অক্ষ থেকে একই দূরত্বে থেকে যায়। 6 নং চিত্রের সাহায্যে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই চিত্রে প্রদর্শিত আধারের প্রস্থচ্ছেদকে তার কেন্দ্র P বিন্দুতে গৌণ অক্ষ ছেদ করে গেছে। ধরা যাক, কোন কণা J বিন্দুতে রয়েছে এবং তার গতি উপরের দিকে। কণাটি তাহলে P বিন্দু থেকে সরে যেতে থাকবে। আবার পরে যখন কণাটির অবস্থান M বিন্দুতে হবে, তখনো তার গতি হবে উপরের দিকে ; ফলে সে কিন্তু তখন P বিন্দুর দিকে সরে আসতে থাকবে। এইভাবে দেখানো যায় যে, কণাটি যতক্ষণ নলের উপরের অর্ধে থাকে, ততক্ষণ সে যতখানি গৌণ অক্ষ থেকে সরে যায়, কণাটি নিচের অর্ধে থাকলে ততখানি ঐ অক্ষের দিকে সরে আসে। সুতরাং মোটের উপর সে গৌণ অক্ষ থেকে একই দূরত্বে থেকে যায়। যে সব আহিত কণার গতি নিচের দিকে, তারাও একই কারণে মোটের উপর গৌণ অক্ষ থেকে একই দূরত্বে থাকে। ফলে আধারটির মধ্যে উপরে বা নিচে আগেকার মতন আহিত কণার আধিক্য হয় না। সেজন্যে কোন উপর-নিচ বিদ্যুৎক্ষেত্র উৎপন্ন হয় না এবং প্লাজমাও বাইরের দিকে সরে যায় না। এই ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র যোগ হওয়ার ফলে।

অন্য একটি কারণে কিন্তু প্লাজমার এখনো বাইরের দিকে সরে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। প্লাজমার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হলে যে বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, বলয়াকৃতি আধারের ভিতরের দিকে তার মান বাইরের দিকের মানের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এজন্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ায় ভিতরের দিক থেকে প্লাজমার উপর যে চাপ P_i প্রযুক্ত হয়, বাইরের দিক থেকে চাপ P_o-এর চেয়ে তা বেশি (7 নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ফলে প্লাজমার প্রবণতা হয় বাইরের দিকে সরে যাওয়ার। প্লাজমার এই গতি রোধ করবার জন্যে বলয়াকৃতি আধার থেকে

কিছুটা উপর ও কিছুটা নিচে তারকুণ্ডলী রেখে ও তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করে উল্লম্ব চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। প্লাজমার মধ্যস্থ বিদ্যুৎপ্রবাহের উপর এই চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়ার ফলে একটি ভিতরমুখী চাপ প্রযুক্ত হয় প্লাজমার উপরে। এই চাপ
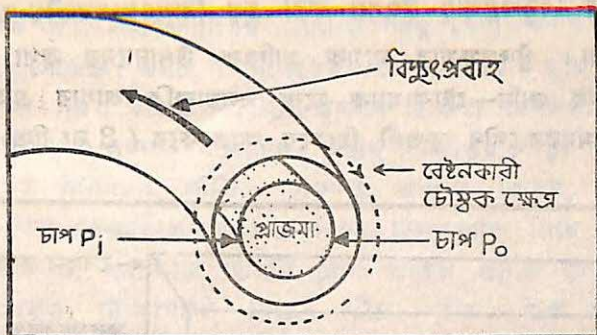
7নং চিত্র—বিদ্যুৎপ্রবাহ ও বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ায় প্লাজমার উপর প্রযুক্ত চাপ

যদি সঠিক মানের হয়, তা হলে ভিতর ও বাইরে থেকে প্লাজমার উপর প্রযুক্ত মোট চাপ সমান থাকে এবং প্লাজমার বাইরের দিকে সরে যাওয়ার আর কারণ থাকে না। বলয়াকৃতি আধারের উপরে ও নিচে যে তারকুণ্ডলীর কথা বলা হল, সেগুলিকে বলা হয় উল্লম্ব ক্ষেত্র কুণ্ডলী (vertical field coils)। এ সব ছাড়াও আধারের উপরে ও নিচে অনুভূমিক ক্ষেত্র কুণ্ডলী (horizontal field coils) বা উল্লম্ব সংশোধন কুণ্ডলী (vertical correction coils) রেখে এবং তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে এমন অতিরিক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয় যে, উপর বা নিচের দিকে প্লাজমার সরে যাওয়ার কোন প্রবণতা থাকলে তাও যাতে রুদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে টোকাম্যাক যন্ত্রে নানান চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে তৈরি এক অদৃশ্য পিঞ্জরে অত্যুষ্ণ প্লাজমাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়।

বলয়াকৃতি আধারের মধ্য দিয়ে যে বিদ্যুৎপ্রবাহের কথা আগে বলা হয়েছে, তা যে কেবল বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, তাই নয়, প্লাজমাকে উৎপন্ন করে তাকে অনেকখানি উত্তপ্তও করে তোলে, কারণ প্লাজমার বৈদ্যুতিক রোধ (resistance) আছে এবং

রোধযুক্ত কোন পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হলে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয়িত হয় ও তার রূপান্তর ঘটে পদাথটির তাপশক্তিতে। বিজ্ঞানী জুলের নামানুসারে এ পদ্ধতিকে বলা হয় 'জুল তপ্তকরণ' (Joule heating)। অনেক সময় আবার ওহ্‌মের নামানুযায়ী একে বলা হয় 'ওহ্‌মীয় তপ্তকরণ' (Ohmic heating)। যা হোক, বলয়াকৃতি আধারে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা হয় বিদ্যুৎচ্চুম্বকীয় আবেশের সাহায্যে। ট্রান্সফর্মার নামক যান্ত্রিক উপাদানের কথা আমরা অনেকেই জানি—টোকাম্যাক যন্ত্রে বলয়াকৃতি আধার একটি বড় ট্রান্সফর্মারের গৌণ কুণ্ডলী হিসেবে কাজ করে (8 নং চিত্র)। ঐ
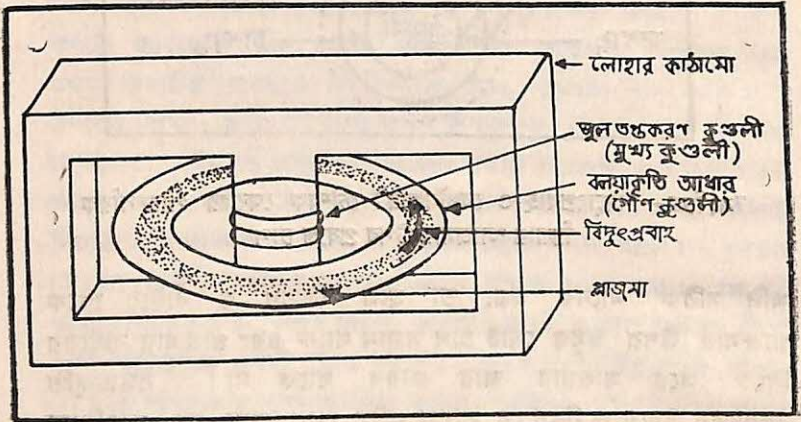
৪নং চিত্র—বলয়াকৃতি আধারে বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎপত্তি

ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালে ও সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিবর্তনশীল হলে বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশের ফলে বলয়াকৃতি আধারের মধ্যে বিভব-পার্থক্য বা ভোল্টেজের সৃষ্টি হয়। এর ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎপত্তি ঘটে এবং তা প্লাজমার সৃষ্টি করে তাকে উত্তপ্ত করে তোলে। এজন্যে ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুন্ডলীকে বলা হয় 'জুল তপ্তকরণ কুন্ডলী' (Joule heating coil)। 8 নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, ট্রান্সফর্মারে তেমনি লোহার কাঠামো ব্যবহার করলে জুল তপ্তকরণ কুন্ডলীর মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে বলয়াকৃতি আধারের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিভব-পার্থক্য সৃষ্টি করা যায়। তবে এর সীমাবদ্ধতা থাকায় এবং অন্যান্য দু-একটি অসুবিধার জন্যেও বর্তমানে অনেক টোকাম্যাক যন্ত্রে,

বিশেষত খুব বড় যন্ত্রগুলিতে বায়ু-মাধ্যমেই বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশের কাজটি হয়ে থাকে।

● টোকাম্যাক সম্পর্কিত গবেষণায় অগ্রগতি

রাশিয়ায় টি-3 নামক টোকাম্যাকে মোটামুটি ঘন প্লাজমাকে 10 লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়েও কিছু বেশি উষ্ণতায় প্রায় 10 মিলিসেকেণ্ড (অর্থাৎ 1 সেকেণ্ডের 100 ভাগের 1 ভাগ সময়) ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে—1968 খৃস্টাব্দে এ কথা ঘোষিত হওয়ার পর টোকাম্যাক সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে যেমন একদিকে টোকাম্যাক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি চীন, ব্রাজিল প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও টোকাম্যাক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। আমাদের দেশেও টোকাম্যাক সম্বন্ধীয় গবেষণার যে সূত্রপাত হয়েছে, আমরা পরে তা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

যে সব টোকাম্যাক নির্মিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের টি-10 ও টি-15, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালকাটর, পি এল টি, ডি-3 ও টি এফ টি আর, জাপানের জে টি-60, ইওরোপের জেট (জয়েণ্ট ইওরোপীয়ান টোরাস —ইংল্যান্ডে অবস্থিত) ও পশ্চিম জার্মানীর অ্যাস্ডেক্স। বর্তমানে কার্যরত বড় আকারের টোকাম্যাক সম্বন্ধে ধারণার জন্যে আমরা আমেরিকার প্রিন্সটনে অবস্থিত টি এফ টি আর (টোকাম্যাক ফিউশান টেস্ট রিয়্যাক্টর) যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি ঃ

প্রধান ব্যাসার্ধ 2 মিটার 48 সেন্টিমিটার, গৌণ ব্যাসার্ধ 85 সেন্টিমিটার, বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্র 5·2 টেসলা অর্থাৎ 52,000 গাউস, প্লাজমায় সর্বাধিক বিদ্যুৎপ্রবাহ 2·5 মেগা-অ্যাম্পীয়ার অর্থাৎ 25 লক্ষ অ্যাম্পীয়ার। কয়েক মাস আগের খবরে প্রকাশ, টি এফ টি আর যন্ত্রে ডয়টেরিয়াম-ট্রিটিয়াম প্লাজমার উষ্ণতাকে 20 কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তোলা সম্ভব হয়েছে। তবে n ও t-এর গুণফলের মান যথেষ্ট না হওয়ায় লসনের শর্ত পালিত হয়নি। আবার এম আই টি-তে অবস্থিত অ্যাল্কাটর যন্ত্রের প্লাজমায় লসনের শর্ত পালিত হয়েছে কিন্তু উষ্ণতা যথেষ্ট হয়নি। আশা করা যাচ্ছে, সংযোজন

চুল্লির জন্যে প্রয়োজনীয় দুটি শর্তই অদূর ভবিষ্যতে একসঙ্গে পালিত হওয়া সম্ভবপর হবে।

টোকাম্যাক সম্পর্কিত গবেষণায় লক্ষণীয় অগ্রগতির মূলে যে প্রধান কারণগুলি রয়েছে, সেগুলি নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল:

(1) তপ্তকরণের পরিপূরক ব্যবস্থা—প্লাজমার উষ্ণতাকে যথেষ্ট বাড়াতে হলে কেবল বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে তা সম্ভব নয়, কারণ উষ্ণতা বাড়তে থাকলে প্লাজমার রোধ কমে যায় এবং 'জুল তপ্তকরণ' ক্রমেই অকেজো হয়ে পড়ে। সুতরাং উষ্ণতা বাড়াবার জন্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছাড়াও পরিপূরক ব্যবস্থা থাকা দরকার। শক্তিশালী বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণাগুচ্ছ অথবা উচ্চশক্তিসম্পন্ন বেতার তরঙ্গ বা মাইক্রো-তরঙ্গ বলয়াকৃতি আধারে প্লাজমার মধ্যে পাঠিয়ে উষ্ণতা বহুলাংশে বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

(2) ডি-টি খণ্ডের অনুপ্রবেশ—টোকাম্যাক যন্ত্রে সাধারণত ডয়টেরিয়াম-ট্রিটিয়াম (সংক্ষেপে ডি-টি) গ্যাসকে প্লাজমায় রূপান্তরিত করে তাকে উত্তপ্ত করা হয়। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ঐ প্লাজমার মধ্যে যদি যথাসময়ে ক্ষুদ্রাকৃতি ডি-টি খন্ডকে (DT pellet) ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তা নিমেষের মধ্যে বাষ্পীভূত হয়ে প্লাজমায় রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে n ও t-এর গুণফলের মান বেশ কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। বস্তুত এই পদ্ধতিতেই সর্বপ্রথম অ্যাল্‌কাটর যন্ত্রে লসনের শর্ত পালন করা সম্ভব হয়েছিল।

(3) প্লাজমার আকৃতি—কোন কোন টোকাম্যাকে বলয়াকৃতি আধারে প্লাজমার আকৃতিকে এমন করা হচ্ছে যে, তার উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদের আকৃতি বৃত্তাকার না হয়ে হয় ইংরেজি অক্ষর D-এর মতন বা বরবটির বীজের চেহারার মতন। এর ফলে একই চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত বেশি চাপযুক্ত প্লাজমাকে (অর্থাৎ উষ্ণতা সমান থাকলে বেশি ঘনত্বের প্লাজমাকে) আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব। তবে এতে প্লাজমার মধ্যে অস্থায়িত্ব অবশ্য বেড়ে যায়।

(4) অতিপরিবাহী চুম্বক—বিদ্যুৎবাহী উপাদান যদি অতি-পরিবাহী হয়, তা হলে তার মধ্য দিয়ে বিপুল বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালেও তার উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সমস্যা থাকে না এবং এইভাবে প্রচন্ড শক্তিশালী

চুম্বক তৈরি করা যায়। এরকম অতিপরিবাহী চুম্বক (super-conducting magnet) ব্যবহার করে টোকাম্যাকে চৌম্বক ক্ষেত্রকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

(5) অবিশুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ—প্লাজমার মধ্যে অবিশুদ্ধির (impurites) উপস্থিতি দূষণের কাজ করে। দূষণ অর্থাৎ দূষিত পদার্থের উপস্থিতি যেমন মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, অবিশুদ্ধির উপস্থিতি তেমনি প্লাজমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। বিশেষত কয়েক ধরনের অবিশুদ্ধি প্লাজমার মধ্যে থাকলে বিকিরণজনিত শক্তিক্ষয় অনেকাংশে বেড়ে যায় ও প্লাজমা অচিরেই উষ্ণতা হারায়। বলয়াকৃতি আধারের ভিতরের দেওয়ালকে যাতে যথাসম্ভব পরিষ্কার ও অক্ষত রাখা যায় এবং প্লাজমা যাতে যথাসম্ভব কম তার সংস্পর্শে আসে, তার জন্যে নানান ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্লাজমায় অবিশুদ্ধির পরিমাণকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা গেছে।

ভারতে টোকাম্যাক

শক্তি-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে টোকাম্যাকের অপরিসীম গুরুত্ব ও এই যন্ত্র সম্পর্কিত গবেষণায় উন্নত দেশগুলির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বিবেচনা করলে আমাদের দেশে এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করবার আবশ্যকতা সহজেই বুঝতে পারা যায়। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে এখন থেকেই টোকাম্যাক ও তার ভিতরের অত্যুষ্ণ প্লাজমা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করা দরকার। তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে, টোকাম্যাক সম্পর্কিত কিছু কিছু সমস্যার এখনো সমাধান হয় নি। এইসব সমস্যা সমাধানে যদি আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করেন, তা হলে তাঁদের সেই গবেষণা একদিকে যেমন সত্যিকারের অর্থবহ হবে, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রসর বিষয়ের চর্চার ক্ষেত্রে ভারতের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে।

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে দুটি টোকাম্যাক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। একটি হল কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নামক প্রতিষ্ঠানে ; গত প্রায় 25 বছর ধরে প্লাজমা সম্পর্কে সেখানে যে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে, তারই সম্প্রসারণ হিসেবে এই প্রকল্পের অবতারণা। অন্য প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল আমেদাবাদের ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে 'প্লাজমা ফিজিক্স প্রোগ্রাম'-এর নামে ;

কয়েক মাস আগে মূলত প্রকল্পটিকেই ঘিরে আমেদাবাদের কাছে গান্ধীনগরে গড়ে উঠেছে ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ। দুটি প্রকল্পেরই উদ্দেশ্য : টোকাম্যাক সম্পর্কিত কিছু কিছু বিষয়ে মৌলিক গবেষণা এবং এই যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জন।

সাহা ইনস্টিটিউটের টোকাম্যাকের একটু বিস্তৃত পরিচয় এখানে দেওয়া হবে। ভারতে এটিই সর্বপ্রথম টোকাম্যাক। ঐ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বিশদ আলোচনার ভিত্তিতে এই যন্ত্র ও তার প্রধান আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি তৈরি করেছেন জাপানের তোশিবা কর্পোরেশন নামক খ্যাতনামা কোম্পানী। যন্ত্রটিকে বসানো ও চালানোর জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পরিকাঠামো ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে তাঁদের বিধাননগরের গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে। ঐ যন্ত্র ও তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলিকে আমদানি করে গত মে মাসে সেগুলিকে যথাস্থানে বসানো হয়েছে এবং যন্ত্রটির বিভিন্ন অংশ পরীক্ষার পর গত 10 জুলাই এটিকে চালু করা হয়েছে সাবিকভাবে। ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ এম আর শ্রীনিবাসন গত 10 ডিসেম্বর টোকাম্যাকটিকে উৎসর্গ করেছেন জাতির উদ্দেশ্যে।

এই টোকাম্যাকের একটি ছবি প্রচ্ছদপটের চিত্রে দেখানো হয়েছে। এটি দৈর্ঘ্যে 2 মিটার 69 সেন্টিমিটার ও উচ্চতায় 2 মিটার 62 সেন্টিমিটার; ওজনে প্রায় আট টন। যন্ত্রটির মুল অংশগুলি নির্দেশ করবার জন্যে কিছুটা সরলীকৃত ভাবে এর একটি নকশা 9 নং চিত্রে দেখানো হল। নকশাটির বাঁ দিকের অধাংশে যন্ত্রটিকে অক্ষত দেখিয়ে ডান দিকের অর্ধাংশে দেখানো হয়েছে যন্ত্রটির মাঝখান বরাবর একটি উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদ অর্থাৎ যন্ত্রটিকে ঠিক মাঝখান দিয়ে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কেটে ফেললে ভিতরের অংশ যেভাবে দেখা যাবে, সেই প্রস্থচ্ছেদ। চিত্রে যে লোহার কাঠামো দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে টোকাম্যাকের ট্রান্সফর্মারের অংশ; 8 নং চিত্র প্রসঙ্গে এই ট্রান্সফর্মারের কার্যপ্রণালী আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই কাঠামোর মাঝখানে 24 সেন্টিমিটার ব্যাসের যে দন্ডটি রয়েছে, তাকে ঘিরে আছে নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত নির্মিত বলয়াকৃতি আধার, যার মধ্যে তৈরি হয় অত্যুষ্ণ প্লাজমা। এই প্লাজমার প্রধান ব্যাসার্ধ 30 সেন্টিমিটার,

গৌণ ব্যাসার্ধ $7\frac{1}{2}$ সেন্টিমিটার। আধারটির ভিতরে 'সীমিতকারী' (limiter) নামে কয়েকটি পাত ব্যবহার করে প্লাজমাকে দেওয়াল থেকে কিছুটা দূরে সীমিত রাখবার প্রাথমিক ব্যবস্থা করা হয়েছে।
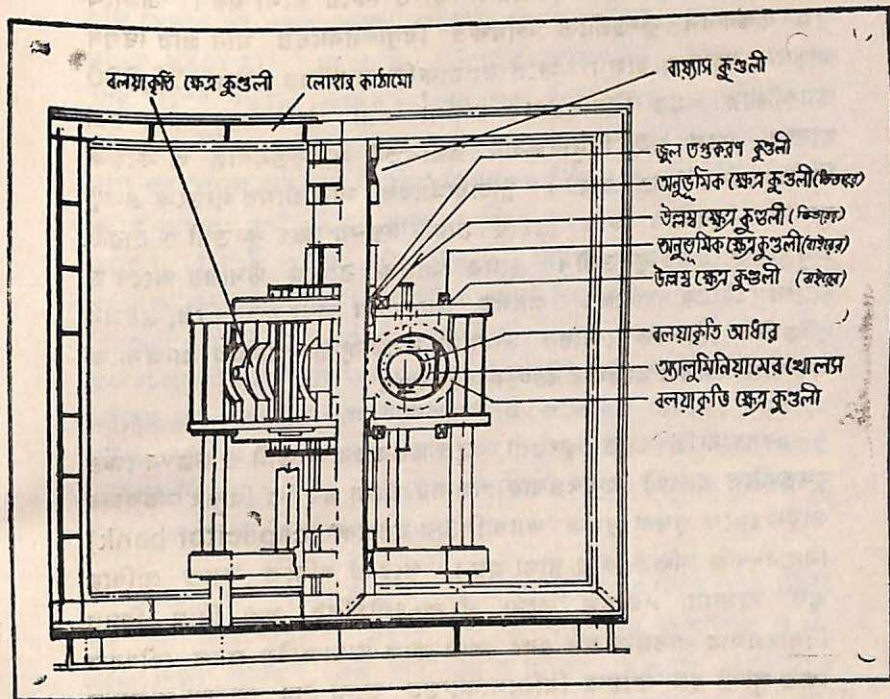
9নং চিত্র—সাহা ইনস্টিটিউটের টোকাম্যাকের কিছুটা সরলীকৃত নক্সা

বলয়াকৃতি আধারকে বাইরে থেকে ঘিরে আছে একটি অ্যালুমিনিয়ামের খোলস (shell)। আধারের মধ্যে প্লাজমাকে যথাস্থানে আবদ্ধ রাখায় এর একটি ভূমিকা আছে। আধার ও খোলসকে বেষ্টন করে রয়েছে ষোলটি বলয়াকৃতি ক্ষেত্র কুণ্ডলী। এগুলির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে প্লাজমার কেন্দ্রস্থলে 2 টেসলা (অর্থাৎ 20,000 গাউস) পর্যন্ত চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়।

ট্রান্সফর্মারের মাঝখানের দণ্ডকে বেষ্টন করে আছে দুটি জুল তপ্তকরণ কুণ্ডলী—এরা ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর কাজ করে। এ দুটিতে বিদ্যুৎপ্রবাহের মান একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি হলে ট্রান্সফর্মারের লৌহ-অংশ সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ বিদ্যুৎপ্রবাহ বাড়ালেও

চৌম্বক বলরেখারা আর বাড়তে চায় না। বায়্যাস কুণ্ডলী (bias coil) নামে দুটি অতিরিক্ত কুন্ডলী ব্যবহার করে ও তাদের মধ্য দিয়ে যথাযথ বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে প্রথমে ট্রান্সফর্মারের মধ্যে ঈপ্সিত দিকের বিপরীত দিকে চৌম্বক বলরেখা সৃষ্টি করে রাখা হয়। এভাবে জুল তপ্তকরণ কুন্ডলীতে কার্যকর বিদ্যুৎপ্রবাহের মান প্রায় দ্বিগুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। ফলে বলয়াকৃতি আধারের মধ্যে 75,000 অ্যাম্পীয়ার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে এই বিদ্যুৎপ্রবাহ স্বভাবতই পরিবর্তনশীল ও কয়েক মিলিসেকেন্ড মাত্র স্থায়ী। ট্রান্সফর্মারের মাঝখানের দন্ডকে একটু দূর দিয়ে বেষ্টন করে রয়েছে চারটি উল্লম্ব ক্ষেত্র কুন্ডলী ও চারটি অনুভূমিক ক্ষেত্র কুন্ডলী। এদের অর্ধেক রয়েছে উপরের অংশে ও অর্ধেক নিচের অংশে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, এইসব কুন্ডলীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে বলয়াকৃতি আধারে প্লাজমাকে যথাস্থানে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করা হয়।

বলয়াকৃতি ক্ষেত্র কুন্ডলী, জুল তপ্তকরণ কুন্ডলী ও উল্লম্ব ক্ষেত্র কুন্ডলীতে যথেষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনার জন্যে প্রথমত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন থেকে পৃথক পৃথক 'ক্যাপাসিটার ব্যাংকে' (capacitor bank) বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চিত করে রাখা হয়। পরে ঐ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে খুব সামান্য সময়ের জন্যে ঐ কুন্ডলীগুলির মধ্য দিয়ে বিপুল বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠানো হয় এবং তার ফলে প্রয়োজনীয় প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে কয়েক মিলিসেকেন্ডের জন্যে উষ্ণ আবদ্ধ প্লাজমার উৎপত্তি ঘটায়। এইভাবে পাঁচ মিনিট (বা আরো বেশি সময়) অন্তর অন্তর বলয়াকৃতি আধারে উষ্ণ প্লাজমা উৎপন্ন করা যেতে পারে। বায়্যাস কুন্ডলী ও অনুভূমিক ক্ষেত্র কুন্ডলীর জন্যে ক্যাপাসিটার ব্যাংক ব্যবহার করা হয় না ; বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের পরিবর্তী প্রবাহ থেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থায় সমপ্রবাহ তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঐ কুন্ডলীগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বলয়াকৃতি আধারে প্লাজমা তৈরি করবার আগে বায়ু-নিষ্কাশন পাম্পের সাহায্যে সেটিকে যথাসম্ভব বায়ুশূন্য করে ফেলা হয়। এই অবস্থায় আধারটিতে সংলগ্ন একাধিক হিটার কুন্ডলীকে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে একনাগাড়ে তিন-চার দিন ধরে আধারটিতে 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় উত্তপ্ত রাখা হয়। আধারটিকে এইভাবে 'সেঁকে

নেওয়ার' (baking) উদ্দেশ্য ঃ আধারটির ভিতরের দেওয়ালের মধ্যে যে সব গ্যাসীয় অণু-পরমাণু শোষিত হয়ে বা অন্যভাবে আবদ্ধ থাকে, সেগুলিকে দেওয়াল থেকে বের করে দেওয়া, যাতে সেগুলি পাম্পের মাধ্যমে আধার থেকে বেরিয়ে চলে যায়। প্লাজমা উৎপন্ন হলে সেগুলি তা হলে আর দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এসে প্লাজমাকে দূষিত করবে না। যা হোক, এইভাবে আধারটিতে বায়ুর চাপ হয় মাত্র 10^{-8} মি.মি. পারদ। অতঃপর আধারটিতে ডয়টেরিয়াম বা যে কোন ঈপ্সিত গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এক বিশেষ ব্যবস্থায়, যাকে বলা হয় 'গ্যাস ফুৎকার ব্যবস্থা' (gas puffing system)। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে। 10^{-3} থেকে 10^{-4} মি.মি. পারদ, এইরকম চাপের সেই গ্যাসকে সামান্য কিছুটা আয়নিত করা হয় প্রাক-আয়নন ব্যবস্থার (pre-ionization system) সাহায্যে। এই ব্যবস্থায় আধারটির এক অংশের মধ্য দিয়ে দ্রুতগামী ইলেকট্রনগুচ্ছ পাঠানো হয় এবং গ্যাসের অণু-পরমাণুর সঙ্গে ইলেকট্রনদের সংঘর্ষের মাধ্যমে আয়নন ঘটিয়ে প্লাজমা উৎপাদনের প্রাথমিক পর্ব সম্পন্ন করা হয়, যাতে তারপর বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশের সাহায্যে উষ্ণ প্লাজমা উৎপাদন অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে।

বলয়াকৃতি আধারের চারধারে এবং উপরে ও নিচে মোট 44টি বড় বড় ছিদ্র আছে। এইসব ছিদ্রের সঙ্গে যুক্ত নলগুলিকে 9 নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে। এই সব নল ও ছিদ্রের মাধ্যমে বলয়াকৃতি আধারের ভিতরের প্লাজমা সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এটা করা হয় দু ভাবে ঃ এক, প্লাজমা থেকে যে সব কণা ও বিকিরণ বাইরে বেরিয়ে আসে, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে ; দুই, বাইরে থেকে বিকিরণ (মাইক্রো-তরঙ্গ, লেসারের আলো ইত্যাদি) বা কণাগুচ্ছ প্লাজমার মধ্যে পাঠিয়ে তাদের উপর প্লাজমার প্রভাব লক্ষ্য করে।

বিধাননগরে সাহা ইনস্টিটিউট ভবনের একতলায় যে ভাবে টোকাম্যাক ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিগুলি রাখা আছে, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাক। একটি গবেষণাগারের কিছুটা একধারে রয়েছে মূল টোকাম্যাক যন্ত্র ; অন্য ধারে রয়েছে একটি নিয়ন্ত্রক (controller), যা বায়ু-নিষ্কাশন পাম্পের কাজ, বলয়াকৃতি আধারকে সেঁকে নেওয়া, আধারে গ্যাসের ফুৎকার ও গ্যাসের প্রাক-আয়ননকে দূর

থেকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামনের ঘরে রয়েছে ক্যাপাসিটার ব্যাংক ইত্যাদি বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবস্থা ও সেগুলির একটি নিয়ন্ত্রক। টোকাম্যাক যন্ত্রের ঘরের পাশের নিয়ন্ত্রণ-কক্ষে রয়েছে মূল নিয়ন্ত্রক ; টোকাম্যাকের মধ্যে প্লাজমা উৎপাদনের সময় তার সাহায্যে যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। টোকাম্যাক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষিত হয় ভূগর্ভস্থ তারসমষ্টিকে (ও কোন কোন ক্ষেত্রে আলোকবাহী তন্তুকে) কাজে লাগিয়ে। টোকাম্যাক যন্ত্রের দু'পাশে যে বেশ কিছুটা জায়গা রাখা আছে, সেখানে ভবিষ্যতে বেতার তরঙ্গের সাহায্যে প্লাজমাকে উষ্ণতর করবার পরিপূরক ব্যবস্থা রাখা হবে, এরকম পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্যে টোকাম্যাকের চারধারে নানান যন্ত্রপাতি বসানোর তোড়জোড় চলেছে। তেমনি আবার আয়োজন হচ্ছে ঐ সব পরীক্ষার তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্যে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে হরেক রকম ব্যবস্থা বসানোর।

সাহা ইনস্টিটিউটের টোকাম্যাক ব্যবহার করে ঐ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা যে সব মৌলিক গবেষণার কথা চিন্তা করছেন, সেগুলির দু-তিনটি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(1) উষ্ণ প্লাজমা থেকে নানারকম বিকিরণ এবং কিছু কিছু কণাও বলয়াকৃতি আধারের ভিতরের দেওয়ালে গিয়ে আঘাত করে। তখন দেওয়াল থেকেও কণা ও বিকিরণ প্লাজমার মধ্যে প্রবেশ করে। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জ্ঞান লাভ করতে উৎসুক কারণ সংযোজন চুল্লিতে এগুলির সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে।

(এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, টোকাম্যাক যন্ত্রে সুদৃঢ় চৌম্বক পিঞ্জর থাকলেও প্লাজমার কিছু কণা কিভাবে দেওয়ালে পৌঁছয়? এর উত্তর হল ঃ যদিও আহিত কণা চৌম্বক বলরেখার চারধারে পাক খেতে খেতে ঐ রেখা বরাবর চলমান হয়, তবে অন্য কোন কণার সঙ্গে সংঘর্ষ হলে তার গতিপথ পরিবর্তিত হয় এবং সে বাইরের দিকে খানিকটা চলে যেতে পারে। এইভাবে কয়েক বার সংঘর্ষের ফলে ঐ কণা ক্রমশ বাইরের দিকে চলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আধারের দেওয়ালে পৌঁছয়। তাছাড়া প্লাজমার মধ্যে স্বতই যে সব স্পন্দনশীল বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, যাদের প্রভাবেও আহিত কণা ক্রমে বাইরের দিকে চলে যেতে পারে।)

(2) প্লাজমার মধ্যে নানা ধরনের 'অস্থায়িত্ব' বা ক্রমবর্ধমান চাঞ্চল্য দেখা দেয়, যেগুলি প্লাজমার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলতে পারে। এগুলির প্রকৃতি সম্যক ভাবে নিরূপণ করে তাদের উৎপত্তি বন্ধ করবার উপায় নির্ধারণ করা বিজ্ঞানীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(3) টোকাম্যাকের প্লাজমার উষ্ণতা বাড়াবার জন্যে অন্যতম পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ প্রয়োগের কথা আগে বলা হয়েছে। এই প্রয়োগের যে সব সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি, সাহা ইনস্টিটিউটে সেগুলি সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পরিকল্পনা রয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলে উষ্ণ প্লাজমা বিষয়ক শিক্ষণ-কেন্দ্র হিসেবে যাতে সাহা ইনস্টিটিউটের অগ্রণী ভূমিকা থাকে, টোকাম্যাককে ঘিরে সেরকম পরিকল্পনাও রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে টোকাম্যাকের ভিত্তিতে সার্থক সংযোজন চুল্লির নির্মাণ প্রায় সুনিশ্চিত ; তখন উষ্ণ আবদ্ধ প্লাজমা সম্পর্কিত প্রযুক্তিবিদ্যার চাহিদা নিঃসন্দেহে খুব বেশি করে দেখা দেবে।

গান্ধীনগরে ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠানে যে টোকাম্যাক স্থাপিত হবে, তার জন্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সাহা ইনস্টিটিউটের টোকাম্যাক প্রকল্প গ্রহণের অনেক আগে থাকতেই। এই টোকাম্যাকের নাম হবে 'আদিত্য'। এর প্রধান ব্যাসার্ধ হবে 75 সেন্টিমিটার, গৌণ ব্যাসার্ধ 25 সেন্টিমিটার, বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্র 15,000 গাউস ও প্লাজমায় বিদ্যুৎপ্রবাহ 250 হাজার অ্যাম্পীয়ার। এই টোকাম্যাক মূলত ভারতেই তৈরি করা হচ্ছে তবে শতকরা 20-25 ভাগ যন্ত্রাংশ ও উপাদান আমদানি করা হবে বিদেশ থেকে।

জেট, টি এফ টি আর ইত্যাদি যে সব বিরাট টোকাম্যাকের কথা আগে বলা হয়েছে, সেগুলির তুলনায় ভারতের দু'টি টোকাম্যাকই অনেকখানি ছোট আকারের। তবে এ দুটির মাধ্যমে আমাদের দেশে যে টোকাম্যাক সম্পর্কিত গবেষণার সূচনা হচ্ছে, এটা আনন্দের কথা। আরো উল্লেখ্য যে, উন্নত দেশগুলি সমেত অন্যান্য কয়েকটি দেশেও একাধিক ছোট টোকাম্যাক নিয়ে কাজকর্ম হচ্ছে, কারণ কিছু কিছু মৌলিক গবেষণার পক্ষে এগুলি অত্যন্ত উপযোগী এবং সেই সব গবেষণার ফল সার্থক সংযোজন চুল্লি নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

এজন্যেই আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা সম্প্রতি বিশেষ সভার ব্যবস্থা করছেন ছোট টোকাম্যাকগুলিতে প্রাপ্ত ফলাফল আলোচনা করবার জন্যে ; প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 1985 খৃস্টাব্দে হাঙ্গেরির বুডাপেস্টে এবং দ্বিতীয় সভা 1986 খৃস্টাব্দে জাপানের নাগোয়ায়। আমরা আশা করবো, ভারতে টোকাম্যাক সম্পর্কিত গবেষণা সার্থক হবে এবং সংযোজন চুল্লি নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারত তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পারবে।*

---

* 5 সেপ্টেম্বর 1987 তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'টোকাম্যাক : শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক প্রবন্ধটিকে অল্পবিস্তর পরিবর্তন করে বর্তমান পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করা হল।

মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি কেবল নয়, তার অস্তিত্বই নির্ভর করছে শক্তির যোগানের উপর। শক্তির যে সব মূল উৎস রয়েছে, সেগুলি কিন্তু দ্রুত হারে নিঃশেষ হয়ে আসছে। সেজন্যে অদূর ভবিষ্যতে শক্তির দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ সম্ভাবনা। এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে মানুষ যদি এক ধরনের কৃত্রিম সূর্য তৈরি করতে পারে। আমরা আলো পাই সূর্য থেকে, আশার আলো পাওয়া যাচ্ছে কৃত্রিম সূর্যের সম্ভাবনা থেকে। বলা বাহুল্য, মানুষের তৈরী সূর্য আসল সূর্যের চেয়ে আকারে অনেক ছোট হবে কিন্তু প্রকৃতিতে হবে একই রকম।

কৃত্রিম সূর্য নির্মাণের জন্যে যে সব যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে আশাপ্রদ হচ্ছে টোকাম্যাক নামক যন্ত্র। বর্তমান পুস্তিকায় এই ভাবী সূর্যের কাহিনী মনোজ্ঞভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

● ● ●

পুস্তিকাটির লেখক ডঃ জয়ন্ত বসু কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর অধ্যাপক ও প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। প্লাজমার বিষয়ে তাঁর বহু মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। কৃত্রিম সূর্যের যা মূল উপাদান, সেই উষ্ণ প্লাজমা সম্পর্কে গবেষণার জন্যে সাহা ইনস্টিটিউটে টোকাম্যাক যন্ত্রকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প কার্যকর হয়েছে তিনি তার অন্যতম কর্ণধার।

লোকরঞ্জক বিজ্ঞান রচনা ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে ডঃ বসুর নাম সুবিদিত। তাঁর 'পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়' নামক গ্রন্থটির জন্যে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংদাস পুরস্কার লাভ করেন। এদেশে বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি বহু বছর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ছিলেন। বর্তমানে তিনি এই পরিষদের সভাপতি।